ভূতের ছাও বনগাঁও

হুমায়ূন কবীর ঢালী

এম্প্রীতি প্রকাশ

উৎসর্গ

ভূতপ্রেমী পাঠকদের

প্রতি ভালোবাসা

সূচি

ভূতএলাকা ৯
মিহির আলীর ভূতরহস্য ২০
লিখতে লিখতে ভূত হয়ে গেলাম ৩০
ভূত সমাবেশ ৪১
ভূতের ভয় ৪৭
আগুনভূত ৫৪
ভদ্দরভূত ৫৯
বাথরুমে ভূতের ছাও ৬৪
ছবির ভূত ৭০
পিচ্চিভূতের বেনাপোল যাত্রা ৭৫
ছিটু কবিরাজ ৮১
ভূতের ছাও বনগাঁও ৮৫
অনির ভূত দেখা ৯২

ভূতএলাকা

এই এলাকাটা ভূতের। এলাকা জুড়ে রয়েছে পুরনো একটা পুকুর। পুকুরটি বিলের ঠিক মাঝামাঝি। চৈত্র-বৈশাখ মাসে পুকুরের তলদেশ শুকিয়ে যায়। পুকুরের এক পাড়ে আছে সাতটি তালগাছ। সাতটি তালগাছে ভয়ঙ্কর সব ভূতদের আস্তানা। এ কারণে এলাকাটির নাম ভূতএলাকা। দিনে দুপুরেও এই এলাকায় আসতে ভয় পায় মানুষজন। যদি আসতেই হয়, দল বেঁধে, দু'চার-পাঁচজন একসাথে আসে।

ভূত এলাকার এক কিলোমিটার দূরত্বে পুব দিকে কেশাইর কান্দি, পশ্চিমে সিকির চর, দক্ষিণে বারআনি এবং উত্তরে সুগন্ধি গ্রাম।

ভয়ঙ্কর সব কাহিনির জনশ্রুতি রয়েছে এ এলাকা নিয়ে। এখানকার ভূতগুলো নাকি রগচটা, একগুয়ে টাইপের। ভূতগুলোর দয়ামায়া বলতে কিছু নেই। মানুষ পেলেই পানিতে নাকানি-চুবানি দিয়ে মেরে ফেলে। কাদা মাটিতে কোমর অব্দি ডুবিয়ে রাখে। ঘাড় মটকে তাল গাছের আগায় ঝুলিয়ে রাখে। অর্থাৎ যাকে পায় তাকেই নানাভাবে হয়রানি করে।

তবে ভূতের কবলে পড়ে কে কখন হয়রানি হয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই কারো কাছে।

সবই জনশ্রুতি।

এসব জনশ্রুতিতে বিশ্বাসী নয় বিন্দু। গোয়ার-গোবিন্দ টাইপের ছেলে। ভূতটুত একদম বিশ্বাস করে না। অবশ্য বিন্দুর ভূতে বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে গাঁয়ের কারো মাথাব্যথা নেই। বরং বাঁকা সুরে অনেকেই বলে, ওর মতো দুষ্টু ছেলে ভূতটুত বিশ্বাস করলেই কী! না করলেই কী! ও নিজেই তো একটা ভূত। পাজি। মুরব্বি গোছের লোকদের কাছে বিন্দু দুষ্টের শিরোমণি। পাড়ার সব দুষ্টের লিডার। সকল ঘটনার হোতা।

প্রতিদিন কোনো না কোনো পরিকল্পনা থাকে বিন্দুর। মাছ ধরা, পাখি শিকার কিংবা অন্য গ্রামের ছেলেদের সাথে হাডুডু, ফুটবল খেলার টিম ছাড়া। তার মানে একটা কিছু নিয়ে সবসময় ব্যস্ত থাকে বিন্দু।

আজও তার পরিবর্তন ঘটেনি। আজ বন্ধুদের নিয়ে বৈঠকে বসেছে। বন্ধুদের মধ্যে রয়েছে হিরা, মিঠু, শান্ত ও সৌরভ। ওরা পরিকল্পনা করছে 'আলীর মা'র ছাড়াবাড়ি নামে খ্যাত খালপাড়ে বসে। ভয়ঙ্কর এক পরিকল্পনা। ভয়ঙ্কর অভিযান। ভূত এলাকা থেকে তালের আঁটি চুরি করে খাওয়ার অভিযান।

তালের আঁটি খাওয়ার লোভে জিভে জল এলেও ভূতএলাকার নাম শুনে কেউ রাজি হতে চায়নি। কিন্তু বিন্দুর যুক্তি আর সাহসের কাছে ওরা হার মেনে তালের আঁটি খেতে রাজি হয়েছে।

তারপরও হিরা বাদে সবাই ভূত এলাকায় যেতে কেমন আমতা আমতা করতে লাগল। সৌরভ তো বলেই ফেলল, আচ্ছা বিন্দু, আজ আঁটি না খেলে হয় না?

আমি বুঝতে পারছি না এত ভয় পাচ্ছিস কেন? পুরুষের এত ভয় কিসের। বিন্দু বুক ফুলিয়ে বলল।

ভয়টয় কিছু না। আমার তালের আঁটি খেতে একদম ভালো লাগে না। বরং তোরা যা।

না, তা হয় না। যেতে হয় সবাই যাবো। আঁটি খেতে ইচ্ছে না করলেও যেতে হবে। হিরা বলল।

হ্যাঁ, হিরা ঠিক বলেছে। সায় দিল মিঠু।

সৌরভের দ্বিরুক্তি করার সাহস হলো না। আমতা আমতা করতে লাগল। বিন্দু খেয়াল করল সৌরভের অবস্থা। তবুও বলল, হ্যাঁ, সবাই যাব। এখন বল কখন যাবি। সন্ধ্যার সাথে সাথে নাকি রাত বাড়লে?

হিরা বলল, রাত বাড়লেই যেতে হবে। সন্ধ্যায় ঘর থেকে বেরোনো কষ্ট হয়। তাছাড়া সন্ধ্যায় নিরাপদ না।

ঠিক আছে যা ভালো মনে করিস।

শেষতক সবাই মিলে ঠিক করল কোন জায়গা থেকে রওনা দেবে, কোথায় এসে আঁটি খাবে। যদি ভূতগুলো ওদের ওপরে আক্রমণ করেই বসে, সবাই মিলে ভূতের সঙ্গে লড়বে। ভূতের সাথে লড়াইয়ে জেতা মামুলি ব্যাপার। এক্ষেত্রে সাহস হচ্ছে বড় কথা। সাহস নিয়ে পাঁচ ছ'জন একত্রে ঝাঁপিয়ে

পড়লে ভূত কেন ভূতের বাপ পর্যন্ত পালাবে। তবে সবাইকে লড়তে হবে। পিছু হটলে চলবে না। যে পিছু হটবে বন্ধুদের দল থেকে তার নাম বাদ পড়বে। বিন্দুর সঙ্গে সবাই অঙ্গিকার করল এরকম। তারপর যে যার পথে পা বাড়াল।

সূর্যের আলোরশ্মিকে পরাজিত করে রাতের আধার ঢেকে দিল পুরো এলাকা। কৃষ্ণপক্ষের রাত। অন্ধকারের ঘনত্ব এমন যে পাউরুটির মতো কেটে স্লাইস করা যাবে।

এমন অন্ধকারেও নির্ধারিত সময় অনুযায়ী এক এক করে সব বন্ধু এসে হাজির হলো একটি জায়গায়।

তারপর ওরা পাঁচ বন্ধু তালের আঁটির লোভে ভয়ঙ্কর একটি পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে রওনা দিল ভূতএলাকায়।

আগে আগে বিন্দু হাঁটছে। ওর হাতে তিন ব্যাটারির টর্চ। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে এগোচ্ছে বিন্দু। বিন্দুকে অনুসরণ করছে সৌরভ, মিঠু, শান্ত ও হিরা।

দুর্বার গতিতে হাঁটছে বিন্দু। যুদ্ধের ময়দানে বীর সৈনিকরা সম্মুখ পানে যেভাবে এগোয়; যেন কিছু সময় পরেই বিরাট কোনো বিজয় ওদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

কোনো প্রকার ভয় বিন্দুর মনকে দুর্বল করতে পারেনি। অন্য বন্ধুরা কিছু ভয় কিছু সাহস নিয়ে বিন্দুর পেছনে পেছনে এগোচ্ছে। বন্ধুদের মনের ভয় তাড়াতে বিন্দু নানারকম গল্প বলছে। বিন্দুর গল্প ওরা কেউ শুনছে, কেউ শুনছে না। কিন্তু বিন্দু গল্প বলতে বলতে এগোচ্ছে।

একসময় ওরা ভূতএলাকায় পৌঁছল। পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়াল। বিন্দু কী যেন ভাবল। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোরা আবার ভয় পাসনে। ভয়ের কিছু নেই। আমরা যদি একতা থাকি কোনো ভয় বা বিপদই আমাদের কাবু করতে পারবে না। মনে রাখিস একতার কাছে সব শক্তিই পরাজিত।

বলেই সবাইকে নিয়ে পুকুরের পূর্ব পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল। একেবারে গাছের নিচে। একটা গাছের আগায় টর্চের আলো ফেলল বিন্দু। অমনি চমকে ওঠল। গাছের আগা থেকে কারা যেন তাকিয়ে আছে। তবে বন্ধুদের কিছু বলল না। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবল অন্ধকারে। ফের আলো ধরল আরেকটি গাছের আগায়। সেখানেও একই অবস্থা। বড় বড় চোখে কারা যেন তাকিয়ে আছে। এতবড় চোখ কোনো প্রাণীর হয় নাকি! এই প্রথম ভয় নামক কিছু বিন্দুকে কুপোকাত করতে চাইল। কাটা দিয়ে উঠল বিন্দুর সমস্ত শরীর। ভয় পেলেও

পুরো ব্যাপারটি চেপে রাখল। তাকে ভয় পেলে চলবে না। বিজয়ের লক্ষ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে খালি হাতে ঘরে ফিরেছে, এমন নজির তার ডায়েরিতে নেই।

ওদিকে সৌরভ রীতিমতো কাঁপতে শুরু করেছে। ভয়ে তার পঞ্চআত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হলে কী হবে! সে ভালো করেই জানে, আঁটি না নিয়ে বিন্দু কিছুতেই এখান থেকে যাবে না। সৌরভ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল হিরার খুব কাছাকাছি। অন্যরা বিন্দুর নির্দেশের অপেক্ষায় রইল। শুধু হিরাকে কিছুটা তৎপর মনে হলো।

বিন্দু আবার চর্টের আলো ধরল গাছের আগায়। এবার গাছের আগা থেকে অসংখ্য চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাহলে তালের আঁটি গেল কোথায়? ভাবল বিন্দু। দিনে এসে সে দেখে গেছে আঁটিতে ভরপুর তাল গাছের আগা। অথচ এখন সব উধাও। তাহলে কি চোখগুলোর আড়ালে আঁটি লুকিয়ে আছে। নাকি তাকে ভয় পাইয়ে দিতে ভূতেরা বড় বড় চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে! সে যাই হোক আঁটি তাকে পাড়তেই হবে। বন্ধুদের কাছে হেরে যেতে রাজি নয় সে। আজ হেরে গেলে তার লিডারশিপ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে। গাঁয়ের অন্যান্য পিচ্চিরা তাকে মানবে না। তার ধমকে ভয় পাবে না। তাই আজকের অভিযানে তাকে সফল হতেই হবে।

অবশ্য ফিরে যাওয়ার মতো একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো মিঠুর কথায়। মিঠু বলল, বিন্দু আমার মনে হয় আঁটি না পেড়ে চলে যাওয়াই ভালো।

এতটা সাহস দেখানো আমাদের উচিত হবে না।

চুপ। খালি হাতে ফিরে যাবো কি করে ভাবলি। কখনো না। বিন্দু কখনো খালি হাতে ফিরে না। ভেতরে ভয় থাকলেও মুখে তাই বলল বিন্দু। সৌরভ ভয়ে কেমন অর্ধেক হয়ে গেছে দেখ।

সৌরভের কথা বলে নিজের দুর্বলতা ঢাকতে চাচ্ছিস? বল তুই ভয় পাচ্ছিস। কাছে এসে হিরা বলল।

ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি আর হিরা গাছে চড়ছি। তোরা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। এই নে চর্ট, নিচ থেকে গাছের আগায় ধরবি।

বলেই মিঠুর হাতে টর্চ দিল বিন্দু। তারপর লুঙ্গি গোছকাছা দিয়ে গাছে চড়ল। একটু চড়েই মিঠুকে উদ্দেশ্য করে বলল, এই শালা টর্চ মারছিস না কেন, হিরা টর্চ তোর হাতে নে। তোর গাছে উঠতে হবে না।

হিরা নিজের হাতে চর্ট নিলো। আলো ধরল গাছের আগায়। বলল, আমিও নাহয় উঠি। উঠব?

দরকার নেই। টর্চ ধরলেই চলবে।

না, তোকে একা গাছে উঠতে দেওয়া ঠিক হবে না। আমিও উঠছি।

টর্চ ধরবে কে?

টর্চ নিয়েই উঠতে পাড়ব। অসুবিধা হবে না।

এই বলে বিন্দুর পেছনে পেছনে গাছে চড়ল হিরাও।

বিন্দু গাছের প্রায় অর্ধেক উঠে গেল। তখনি একটা দমকা হাওয়া ওর শরীরে ধাক্কা দিলো। কাটা দিয়ে উঠল বিন্দুর শরীর। আরো শক্ত করে ধরল গাছ। হাত পায়ের উপর ভর করে কিছু সময় জিরিয়ে নিলো। তারপর ফের উঠতে শুরু করল। তাকাল গাছের আগায়। এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল বিন্দু। গাছের আগা থেকে চোখগুলো দুষ্টুমি শুরু করে দিয়েছে। আঁকাবাঁকা চোখে তাকাচ্ছে ওর দিকে। ভূতের চোখ কি এরকম হয়? একটা ভূতের কি অসংখ্য চোখ থাকে? এসব প্রশ্ন মনের মাঝে হাবুডুবু খেতে শুরু করল। তবুও উপরের দিকে উঠতে লাগল বিন্দু। কিন্তু এ কী কাণ্ড! বিন্দু যত উপরে উঠছে, ওর থেকে গাছের দূরত্ব তত বাড়ছে। ভূতগুলো কী গাছটাকে টেনে লম্বা করে দিলো? নিচের দিকে তাকাল বিন্দু। একই অবস্থা। হিরা ওর থেকে অনেক নিচে। এ অবস্থায় গাছ থেকে নেমে যাবে কিনা ভাবল। কিন্তু এতটা উঠেও নেমে যাওয়া বোকামি। কাপুরুষের কাজ।

হঠাৎ কে যেন ডাকল বিন্দুকে। হিরা কিংবা সৌরভ ডাকল কী? কেন ডাকল?

এই আমাকে কিছু বলছিস? বিন্দু জিজ্ঞেস করল।

হিরাদের কাছ থেকে কোনো জবাব এলো না। আবারও ডাকল বিন্দু। এবারও কেউ সাড়া দিল না। তাহলে কী হিরারাও ওর ডাক শুনতে পায়নি? কেনই বা শুনতে পাবে না? হিরা তো তার থেকে খুব দূরে না।

ভূতেরা কী তার কথাগুলো আটকে দিচ্ছে? কথা কি আটকে দেওয়া যায়?

নাকি ভূতদের কাছে সবকিছুই সম্ভব! সব ভয় সন্দেহ মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করল বিন্দু। সেই সাথে তালগাছটাকে শক্ত করে চেপে ধরল। যাতে ভূতেরা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে না পারে।

আবারো গাছ বেয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করল। তখনি কে যেন বলল, তোর সাহস তো কম নয়, আমাদের তোয়াক্কা না করে গাছে চড়েছিস। ভালো যদি চাস, এক্ষুণি নেমে যা নিচে। নইলে তোর হাড়মাংস গুঁড়ো করে দেবো।

চমকে উঠল বিন্দু। শরীরের প্রত্যেকটা লোম কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে গেল। ভয়ে পুরো শরীর অবশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। হাতেপায়ে আগের

মতো শক্তি নেই। ধীরে ধীরে তার শক্তি লোপ পাচ্ছে কেন? ভূতেরা কী তাকে কায়দা করে ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলতে চাচ্ছে? না, তা হয় না।

মনে মনে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে আবারো গাছ বাইতে চেষ্টা করল। পারল না। কেননা, দ্বিধা এবং ভয় গ্রাস করল বিন্দুকে। এখন সে কী করবে? এই মুহূর্তে কিইবা করার আছে? অথচ আজকের বিজয়ের উপর নির্ভর করছে তার আগামীদিনের নেতৃত্ব। নিজের বিশ্বাস টিকে থাকা না থাকা।

বন্ধুদের সকল বাধা উপক্ষো করে অসীম সাহসী, অকুতোভয় সৈনিকের মতো ভূত এলাকায় এসেছে সে। গাছে ওঠার আগেও যদি মিঠুর কথায় ফিরে যেত, তাতেও বাকি ইজ্জত থাকত। এখন আঁটি না নিয়ে যদি নিচে নেমে যায়, আগামীকাল থেকে বন্ধুদের মুখ দেখাবে কী করে! সবাই তার মুখে থুথু ছিটাবে। ধিক্কার দেবে। দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে দল থেকে। তার বীরত্ব চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে।

ভূতগুলো বোধহয় তাকে সমস্যায় ফেলবে। রেহাই দেবে না। তালের আঁটি পাড়া তো দূরের কথা জীবনমরণ সমস্যাই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। না সে গাছের আগায় যেতে পারছে, না নিচে নামতে পারছে। ভয়াবহ এক অগ্নিপরীক্ষার মোকাবেলা করতে হচ্ছে তাকে। জীবনে এমন কঠিন পরীক্ষায় কখনো পড়েনি।

ভূতের কণ্ঠ ভেসে এলো আবার।

এত সাহস তোর এখনো গাছের নিচে নামছিস না।

বিন্দু ভাবল, ভূতের সঙ্গে আলাপ করে দেখা যেতে পারে। অন্তত দু'একটা আঁটিও যদি চেয়ে নেওয়া যায় তাদের থেকে বেঁচে যাবে সে। লিডারশিপটাও থেকে যাবে। তাই সাহস করে বলল, আমি জানি না কোত্থেকে কথা বলছ। ঠিক আছে। আমি আর কখনো সাহস দেখাবো না। শুধু এবার আমাকে সাহায্য করো। একটা আঁটি হলেও আমাকে নিতে দাও।

এত লোভ কেন তোর?

লোভ নয়? আঁটি না নিয়ে যদি ফিরে যাই বন্ধুমহলে মুখ দেখাতে পারব না।

মরে গেলে কীভাবে মুখ দেখাবি?

না, না, আমি মরতে চাই না। আমাকে ক্ষমা করে দাও।

পৃথিবীতে ভূত আছে একথা বিশ্বাস করছিস তাহলে?

একশ বার, হাজার বার। এই গাছ ছুঁয়ে বলছি ভূত আছে।

হি-হি-হি আমাকে হাসালি তুই। তোর এই কসম আমরা মানছি না।

ঠেকায় পড়েছিস বলেই এসব বলছিস। তোকে প্রমিজ করতে হবে আর কখনো এখানে আসবি না।

দিনেও কি আসতে পারব না?

কখনো না।

ঠিক আছে, আর কখনো ভূতএলাকায় আসবো না। তবে আজ আঁটি নিতেই হবে। তোমাদের পায়ে ধরছি। আজ আঁটি নিতে নিষেধ করো না।

আজ তোকে আঁটি নিতে দেবো না।

অবস্থা বেগতিক দেখে বিন্দু ভাবনায় পড়ল। হঠাৎ ওর মনে পড়ল হিরা তাকে একটা ভূতের মন্ত্র শিখিয়েছিল। শিখিয়ে হিরা বলেছিল, জানি তুই ভূতটুত বিশ্বাস করিস না। তবু কখনো যদি ভূত এসে তোর সামনে হাজির হয়, এই মন্ত্রটা পড়িস। দেখবি ভূতের দল বাপ বাপ বলে পালিয়ে যাবে।

দেরি না করে মন্ত্রটা পড়তে শুরু করল বিন্দু।

ভূতং ছুতং ভোঁ ভোঁ
ছটং ফটং মো মো
মন মোরং ভয়ং নি
স্বপং যপং তপং চি
রাতবি রাতিং চুরং
মাতবি মাতিং সুড়ং
তোরং দাদুং দোস্তি
তোরং সাথং কুস্তি
হাড়ং গুড়ং জলদি
বাচং চাহং দৌড়দি
ভূতং রাজাং কিরকিরিং
পিতং মিতাং শুররিরিং
চট জলদি সরে যা
গোষ্ঠী শুদ্ধ মরে যা।

বেশ ক'বার পড়ল মন্ত্রটা। মন্ত্রে বোধহয় কাজ হলো। ভূতের কণ্ঠ আপাতত শোনা যাচ্ছে না।

মন্ত্রের বলে ভূতেরা পালিয়ে গেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি আঁটি নিয়ে চলে যেতে পারলেই বাঁচে।

গাছ বাইতে শুরু করল বিন্দু। গাছের আগায় পৌঁছতে এখন আর তেমন দেরি হয়নি। সে দেখল ঠিক যেখানে ভূতের চোখগুলো ছিল, সেখানে সুন্দরভাবে আঁটিগুলো সাজানো আছে। ঝটপট ছুরি দিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কয়েকটা আঁটি কাটল। এরপর ছুরিটি মুখে কামড়ে ধরে দ্রুত নিচে নেমে এলো।

বিন্দুকে সুস্থ শরীরে নামতে দেখে বিন্দুর বন্ধুরা খুশিতে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাল। বিন্দুর চোখেমুখে তখন বিজয়ী বীরের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। এক বুক উচ্ছ্বাস বিন্দুর মাঝে। আজ ভয়ঙ্কর একটা অভিযানে জয়ী হয়েছে সে। জয়ের সেই আনন্দে একটু আগের সকল ভয়-দ্বিধা যেন মুহূর্তে কেটে গেল। বিন্দু ভাবল, আঁটি পাড়তে গিয়ে পাওয়া ভয়ের কথা বন্ধুদের বলা যাবে না। ঘুণাক্ষরেও যদি টের পায় সে ভূতের ভয় পেয়েছে, তাহলে রেহাই নেই বন্ধুদের কাছ থেকে। তাই বুক ফুলিয়ে বলল, দেখলি তো আঁটি পাড়া কোনো ব্যাপার না। এবার গুণে দেখ ক'টা আঁটি পেড়েছি।